গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭১ বর্ষ ২৯ সংখ্যা ১ - ৭ মার্চ ২০১৯ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.com আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

আদিবাসী ও বনবাসী মানুষকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র

প্রতিবাদ জানাল এসইউসিআই(সি)

এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২১ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

আজ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে যে, এ দেশের ১৬টি রাজ্যের ১১ লক্ষ ২৭ হাজার ৪৪৬ জন আদিবাসী ও বনবাসী গরিব জনগণ তাদের বসতজমির উপর বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত অধিকার হারাতে বসেছেন। রাজ্য সরকারগুলি হুমকি দিয়েছে, নিজেদের অধিকারের সমর্থনে প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র না দেখাতে পারার জন্য তাদের ওই জমি থেকে উচ্ছেদ করা হবে। সকলেই জানেন, এই দরিদ্র নিঃস্ব মানুষগুলি ন্যূনতম সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক অধিকারগুলি থেকে বঞ্চিত হয়ে চরম দারিদ্রের মধ্যে জীবন যাপন করেন, বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় রুটি-রুজির সংস্থানটুকুও এঁদের নেই। এখন এই উচ্ছেদের নোটিশের অর্থ দাঁড়াবে জমিতে বসবাস করার অধিকারটুকুও হরণ করা। যা তাঁদের পথের ভিখারিতে পরিণত করে কুকুর-বেড়ালের মতো মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে।

দেশের দরিদ্রতম নাগরিকদের নিজেদের পৈতৃক জমি থেকে উচ্ছেদের এই হুকুমে এই আশঙ্কাই দৃঢ় করে যে, আদিবাসীদের অধিকারে থাকা এই বিরাট পরিমাণ জমির উপর জমি-হাঙর, আবাসন-ব্যবসায়ী, বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থা ও অন্যান্য কায়েমি স্বার্থবাদীদের হয়ত ব্যবসায়িক নজর পড়েছে যা এদের অনুগত সরকারগুলির দ্বারা অনুমোদিত হয়ে বন-ধ্বংসের ঘৃণ্য পরিকল্পনাকেই ত্বরান্বিত করবে। আমরা উচ্ছেদের মতো এই অমানবিক কাজের তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং জনগণের প্রত্যক্ষ ক্ষতিসাধনকারী এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি।

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও শিক্ষক কমরেড স্ট্যালিনের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সামিল হোন

১৮ ডিসেম্বর ১৮৭৮ - ৫ মার্চ ১৯৫৩

লেনিনবাদ সম্পর্কে স্ট্যালিনের উপলব্ধি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঠিক উপলব্ধি। এই উপলব্ধির ভিত্তিতেই সাম্যবাদী আন্দোলন বর্তমান স্তরে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। ...এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, তাঁর পূর্বসূরী মার্কস-এঙ্গেলস এবং লেনিনের মতো স্ট্যালিনও মার্কসবাদ লেনিনবাদ সম্পর্কে একজন অথরিটি। ...তত্ত্বগত ক্ষেত্রে অনন্য ক্ষমতার অধিকারী হিসাবেই শুধু নয়, সাম্যবাদী আন্দোলনের একজন অসামান্য সংগঠক হিসাবেও মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের সঙ্গে স্ট্যালিনও আমাদের স্মৃতিপটে অম্লান হয়ে থাকবেন। ... স্ট্যালিনকে মুছে ফেলার অনিবার্য পরিণাম হল তাঁর অথরিটিকে অস্বীকার করা, যার অর্থ লেনিনবাদ সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি যেটি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে আজকের দিনের সঠিক উপলব্ধি, তাকেই অস্বীকার করা।

— **শিবদাস ঘোষ**

শোষিত গরিব মানুষকে মেরে কীসের দেশপ্রেম!

কাশ্মীরে সিআরপিএফ জওয়ানদের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর দেশের নানা প্রান্তে যেভাবে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ নিগৃহীত হচ্ছেন তাতে শুভবুদ্ধির নাগরিক মাত্রেই উদ্বিগ্ন। এ রাজ্যেও নয় নয় করে নিগ্রহের বেশ কিছু ঘটনা ঘটে গেছে। কাশ্মীরিদের উপর হামলা ছাড়াও যাঁরা এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সরকারি অপদার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন কিংবা সরকারি নেতা-মন্ত্রীদের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধং দেহি বক্তৃতাবাজি সম্পর্কে নিজের মত প্রকাশ করেছেন, তাঁরাও আক্রান্ত হচ্ছেন। মেদিনীপুরে এক ইঞ্জিনিয়ারকে সংগঠিত বাইক-বাহিনী মারধর করেছে, মেরে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে। কারণ তিনি ফেসবুকে নিজের মত পোস্ট করেছিলেন। তাঁর মতে, পাকিস্তানি মাত্রেই খারাপ মানুষ— এ কথা তিনি মনে করেন না। হিংস্রতার বিরুদ্ধে হিংস্রতা, এই সমাধানে তিনি বিশ্বাস করেন না। তিনি যুদ্ধের বিরুদ্ধে।

কলকাতায় দু-দশক ধরে বসবাস করা কাশ্মীরি চিকিৎসককে যেভাবে নিগ্রহ করা হয়েছে কিংবা নদীয়ায় গত দশ বছর ধরে শাল বিক্রির সূত্রে যাতায়াত ও বসবাস করা শাল বিক্রেতাকে যেভাবে দলবদ্ধভাবে মেরে মুখ ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে তা দেখে অনেকেই বলছেন, এ কোন বাংলা, কোন কলকাতা! এই বাংলা, এই কলকাতা আমাদের চেনা নয়। এ রাজ্য এর থেকেও বড় অনেক বিপন্নতার সময়ে গভীর সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছে। অন্যত্র নিগৃহীত, আক্রান্তদের আশ্রয়স্থল হিসাবে কাজ করেছে। ধর্ম-প্রদেশ নির্বিশেষে বিপন্ন মানুষের প্রতি সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সহিষ্ণুতা, সৌভ্রাতৃত্বের দীর্ঘ ঐতিহ্য দেশ জুড়ে এ রাজ্য সম্পর্কে যে গভীর আস্থা তৈরি করেছে তা থেকেই কলকাতার এক শাল বিক্রেতা নিগ্রহের পরও অনায়াসে বলতে পারেন, শ্রীনগর নয়, কলকাতায় রয়েছি শুনলেই মা বেশি শান্তি পান। এই নিরাপত্তার বোধ তো একদিনে তৈরি হয়নি। আপনাআপনিও তৈরি হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে বহু মানুষের সচেতন সংগ্রামের ফসল এটি। যা আজ ভাঙতে বসেছে। বাংলায় এই ঐতিহ্যটি কীভাবে গড়ে উঠেছিল? আর আজ তা ভাঙতেই বা বসেছে কেন?

প্রথমত, কাশ্মীরিদের উপর, কিংবা স্বাধীন মতপ্রকাশকারীদের উপর বা সরকারি অপদার্থতার সমালোচকদের উপর হামলার যে ঘটনাগুলি ঘটছে তা স্বতঃস্ফূর্ত নয়, কিংবা গভীর দেশপ্রেমে বা জওয়ানদের নিহত হওয়ায় গভীর শোকে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলার ফল নয়। দেশপ্রেম মানে তো দেশের মানুষের প্রতি ভালবাসা! গরিব শাল বিক্রেতা, ফলওয়ালাকে মারাটা কি দেশপ্রেম! যদি আক্রমণকারীরা দেশপ্রেমের ভেকধারী না হয়ে যথার্থ দেশপ্রেমী হতেন তবে জওয়ানদের নিহত হওয়ার ঘটনায় তাঁদের মনে এ প্রশ্নই প্রথম উঠত যে, ঘটনা ঘটতে পারল কী করে? বাস্তবে রাষ্ট্রপতি শাসন ও সামরিক শাসনের আওতায় থাকা কাশ্মীরে বিশেষত চরম নিরাপত্তায় মুড়ে রাখা পুলওয়ামায় এমন ঘটনা ঘটতে পারল কী করে? এত বিপুল পরিমাণ আরডিএক্স, যা একমাত্র সেনা বাহিনীই ব্যবহার করে, তা এল কোথা থেকে? গোয়েন্দা সতর্কতা সত্ত্বেও কেন কোনও অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হল না? যাতে ভবিষ্যতেও এভাবে আবার জওয়ানদের প্রাণ দিতে না হয়, তার জন্য দ্রুত তদন্ত করে এ সবের জন্য দায়ী এবং দোষীদের চিহ্নিত করার দাবিই তো সবার

দুয়ের পাতায় দেখুন

পুলওয়ামায় সেনাহত্যা ও ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী হুমকির প্রতিবাদে ২৩ ফেব্রুয়ারি দেশজুড়ে এস ইউ সি আই (সি)-র বিক্ষোভ। (ছবি) শিলিগুড়ির কোর্ট মোড়

বিভেদের রাজনীতি থেকে মুনাফা তোলে শোষকরা

একের পাতার পর

আগে ওঠার কথা। তা না তুলে প্রশ্নকারীদের উপরই হামলা চালানো পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া ঘটতে পারে না। যার উদ্দেশ্য দেশপ্রেমের নামে জিগির তোলা এবং দেশপ্রেমের ঠিকাদারিটা শাসক দলের নেতাদের হাতে রাখা, সরকারের যে কোনও সমালোচককেই দেশদ্রোহী বলে দেগে দেওয়া এবং এইভাবে যে কোনও বিরোধী কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেওয়া। স্বাভাবিকভাবেই যত দিন যাচ্ছে তত জিগিরের পিছনের পরিকল্পনার কথা সামনে এসে যাচ্ছে। যে প্রধানমন্ত্রী এতবড় ঘটনার সংবাদ পাওয়ার পরেও শুটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন, নৌকাবিহার করছিলেন, তিনিই তারপর সভায় সভায় দেশপ্রেমের ফুলঝুরি ছোটাচ্ছেন। তাঁর দলের ছোট-বড় সব নেতারাই নেমে পড়েছেন এই জিগির তোলার কাজে। এক মন্ত্রী তো এমনকী পাকিস্তানের নদীগুলিতে জল বন্ধ করে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছেন।

এই জিগির তোলাটা সরকারের সমস্ত ব্যর্থতাকে ধামাচাপা দিতে বিজেপি সরকারের বিশেষ দরকার। কারণ গত পাঁচ বছরে এই সরকার জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে— কৃষি শিল্প কর্মসংস্থান, কিংবা প্রতিরক্ষা বা বৈদেশিক সম্পর্ক— সমস্ত কিছুতে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। রামমন্দির নির্মাণ নিয়ে যে জিগির তারা তুলতে চেয়েছিল সেটা ব্যর্থ হয়েছে। সিবিআই জুজুও কাজ দেয়নি। এই অবস্থায় জওয়ানদের মৃত্যুকে সামনে রেখে দেশপ্রেমের জিগির তোলার রাস্তাটিই একমাত্র এই ব্যর্থ সরকারের সামনে খোলা ছিল। গুজরাটের এক বিজেপি নেতা প্রকাশ পাণ্ড্য দলের গোপন পরিকল্পনাকে প্রকাশ করে ফেলেছেন। বলেছেন, জাতীয়তাবাদকে ভোটে পরিণত করতে হবে। সঙ্ঘ পরিবারও তাদের কর্মসূচিতে বদল ঘটিয়ে রামমন্দিরের পরিবর্তে জাতীয়তাবাদের নামে মেরুকরণকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে। এই সামগ্রিক পরিকল্পনারই অঙ্গ কাশ্মীরি বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে মুসলিম বিরোধিতার জিগির তোলা।

কিন্তু শাসক বিজেপি এবং তার দোসর সংঘ পরিবার জিগির তোলার যত চেষ্টাই করুন, দেশ জুড়ে সাধারণ মানুষের একটা অংশ সাহসের সাথে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। এ রাজ্যেও সর্বত্র তাঁরা রুখে দাঁড়াচ্ছেন। আক্রান্তদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। কাশ্মীরিদের উপর দেশজুড়ে বিজেপি-সংঘ পরিবারের আক্রমণ সত্ত্বেও সে রাজ্যে নানা কাজে অন্য রাজ্য থেকে যাওয়া মানুষদের প্রতি কাশ্মীরের মানুষ সহমর্মিতার হাতই বাড়িয়ে দিয়েছেন, বুক দিয়ে আগলেছেন। বলেছেন, ভাই বেঁচে থাকতে ভাইয়ের কোনও ক্ষতি হতে দেবে না। বিভেদকামী সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে সমাজের এই শক্তিই সবচেয়ে বড় ভরসা। এই অংশটিকেই আজ সমস্ত দিক থেকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। সে ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটিকে কিছুতেই এড়িয়ে যাওয়া যাবে না যে, এ রাজ্যে একদা শক্তিশালী এই সামাজিক শক্তিটি কিছুটা হলেও দুর্বল হল কী করে? এই দুর্বলতার সুযোগেই তো সাম্প্রদায়িক তথা প্রগতিবিরোধী অংশটি কিছুটা হলেও শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছে। তা ঘটতে পারল কী করে?

এ রাজ্যে প্রগতিশীল সামাজিক শক্তিটির গড়ে ওঠার ইতিহাসটি দীর্ঘ। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের নবজাগরণ আন্দোলন দিয়ে এর শুরু। পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসের আপসমুখী নেতৃত্ব সমাজ থেকে জাতপাত-ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিভেদ দূর করতে যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার দরকার ছিল তা পুরোপুরি অবহেলা করলেও একদিকে আপসহীন বিপ্লবী কর্মকাণ্ড, অন্য দিকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের কর্মপ্রক্রিয়ায় এই ধারাটি অনেকখানি শক্তিশালী হয়েছে এবং জাতপাত ধর্ম-বর্ণের পরিচয়কে পিছনে ঠেলে জনগণের মধ্যে ভারতীয় পরিচয়টিকে সামনে আনার চেষ্টা করেছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী কালে দীর্ঘ সময় ধরে কংগ্রেস রাজ্যে রাজ্যে এবং কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকলেও সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাতের বিভেদকে সমাজ থেকে নির্মূল করার পরিবর্তে এগুলিকে প্রয়োজন মতো ভোটে জিততে কাজে লাগিয়েছে। বিপরীতে পাঁচের দশক ছয়ের দশকে কংগ্রেসি অপশাসনের বিরুদ্ধে লাগাতার বামপন্থী গণআন্দোলন জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শোষিত সাধারণ মানুষকে সমস্বার্থবোধের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। এর দ্বারা জনগণের মধ্যে একটা সংগ্রামী মানসিকতাও গড়ে উঠেছিল, যা সারা দেশে এ রাজ্যকে একটা বিশিষ্টতা দিয়েছিল। এর ব্যতিক্রম শুরু হয় যুক্তফ্রন্ট সরকারে সিপিএমের সংকীর্ণ রাজনীতির মধ্য দিয়ে। জ্যোতি বসু পুলিশমন্ত্রী হওয়ার সুবাদে সরকারি ক্ষমতা ও পুলিশকে কাজে লাগিয়ে যে কোনও ভাবে, কোনও রকম নীতি-আদর্শের তোয়াক্কা না করে দলের শক্তি বাড়ানোর রাজনীতিই এই সামাজিক শক্তির ক্ষয় শুরু করে। পরবর্তী কালে চৌত্রিশ বছরের শাসনের ইতিহাস তো লাল পতাকা হাতে নিয়ে বামপন্থাকে কলঙ্কিত করারই ইতিহাস। লাল পতাকা দেখে, মুখে ইনকিলাবির স্লোগান শুনে যে মানুষগুলি একদিন জড়ো হয়েছিল দলের নেতারা তাদের না দিয়েছেন বামপন্থার পাঠ, না শিখিয়েছেন লড়াই করতে। উন্নত সর্বহারা রুচি-সংস্কৃতির আধারে শ্রেণিসংগ্রাম ও গণসংগ্রামগুলিকে গড়ে তোলার পরিবর্তে শিখিয়েছেন— লড়াই নয়, আন্দোলন নয়, কেবল আমাদের সাথে থাকো, তা হলেই কিছু পাবে। এই পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি, সংগ্রামবিমুখতার রাজনীতি মানুষকে সুবিধাবাদী করে, আদর্শগত ভাবে দেউলিয়া করে দেয়। তাই সরকার বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে শুধুমাত্র সুবিধা পাওয়ার আশাতেই দলে দলে সিপিএম সমর্থক মানুষ তৃণমূলে যোগ দেয়, বিজেপিতে যোগ দেয়। আজ যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনীতি এ রাজ্যে কিছুটা হলেও জায়গা করতে পারছে তার পিছনে রয়েছে এই দেউলিয়া রাজনীতির ভূমিকা, যা বামপন্থার, কমিউনিজমের সুনামকে নষ্ট করেছে। এস ইউ সি আই (সি)-র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, এ যুগের অন্যতম মার্কসবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ সেই ১৯৬৭ সালেই সিপিএমের এই নীতিহীন রাজনীতির পরিণতি কী মারাত্মক হতে পারে সে সম্পর্কে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, "এই পরিস্থিতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং জনসংঘের মতো ধর্মীয় রাষ্ট্রীয়তাবাদীরা ওৎ পেতে বসে আছে। তারা সুযোগের অপেক্ষা করছে। বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি মানুষের যে আকর্ষণ আজও রয়েছে তা নষ্ট হয়ে গেলেই তারা আত্মপ্রকাশ করবে। এ কথাটা ক্ষমতাসীন সিপিআই(এম) নেতারা বুঝছেন না। তাঁরা কমিউনিজমের আদর্শ, মূল তত্ত্ব বাদ দিয়ে প্রায় কংগ্রেসেরই মতন বড় বড় বুকনি আর মিষ্টি কথার চালাকিতে জনতাকে বিভ্রান্ত করে চলেছেন। এইভাবে কমিউনিজমের সুনামকে নষ্ট করে দিয়ে তাকে কালিমালিপ্ত করছেন।" (*যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি ও পার্টির সাংগঠনিক কাজকর্মের কয়েকটি দিক*)।

আবার যে তৃণমূল নেত্রী আজ উগ্র দেশপ্রেমীদের কার্যকলাপ দেখে বলছেন, এটা বাংলার সংস্কৃতি নয়, সংস্কৃতির এই অধঃপতনে তাঁদের ভূমিকাও কম নয়। তাঁদের রাজনীতিটাও তো আসলে সিপিএম ধারাবাহিকতারই রাজনীতি। তাঁরাও তো সাম্প্রদায়িক শক্তিকে আটকাতে জনগণের মধ্যে আদর্শগত মান উন্নয়নের কোনও চেষ্টা না করে বরং ধর্মীয় কর্মসূচিতে বিজেপির সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। তাঁদের নেতা-কর্মীদের কতজনকে সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন? দুর্নীতি থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন? তাঁরাও তো বিরোধী কণ্ঠকে স্তব্ধ করার সিপিএমের ধারাবাহিকতায় রক্ষা করে চলেছেন। যে ভাবে হোক ভোটে জেতাই তো তাঁদের রাজনীতির একমাত্র লক্ষ্য। এই রাজনীতি দিয়ে কি সামাজিক চেতনার মান উন্নয়ন করা যায়? নাকি একদিনের অর্জিত মানকে রক্ষা করা যায়?

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ধারাবাহিক ভাবে কংগ্রেস সিপিএম তৃণমূলের নীতিহীন রাজনীতিই বাংলার সমৃদ্ধ চেতনাকে তিলে তিলে ধ্বংস করেছে। রাজনৈতিক নেতারা সমাজের অভিভাবক। তাঁরা জনসাধারণকে যে পথ দেখান সাধারণ মানুষ মূলত সে পথেই হাঁটেন। একদিন নেতাজি, ভগৎ সিং, মাস্টারদা সূর্য সেনের মতো নেতারা সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন, সুকঠিন জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে ছাত্র-যুব সমাজের আদর্শ হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন, প্রাতঃস্মরণীয়ে পরিণত হয়েছেন। আর এই দলগুলির নীতিহীন রাজনীতি জনসাধারণের মনে রাজনীতিই সম্পর্কেই ঘৃণার মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এই রাজনীতি বিমুখতা জনগণের মধ্যে সমাজবিমুখতা গড়ে তুলছে, যা প্রতিক্রিয়ার রাজনীতিকে শক্তিশালী হতে সাহায্য করছে। আজ যদি প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে প্রতিহত করতে হয়, বাংলার পুরনো ঐতিহ্যকে আবার তুলে ধরতে হয়, তবে রাজনীতিতে নীতির উপর জোর দিতে হবে, রুচি-সংস্কৃতির চর্চার উপর জোর দিতে হবে এবং জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে সামনে রেখে ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে শোষিত মানুষকে একত্রিত করে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আন্দোলনের মধ্যেই মানুষগুলি বুঝবে, জাতপাত-ধর্ম-বর্ণে বিভাজনের দ্বারা তার কোনও লাভ হয় না, বরং তার বেঁচে থাকার আন্দোলনগুলিই দুর্বল হয়। লাভবান হয় শোষকরা, শাসক শ্রেণি।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের দীর্ঘ দিনের সমর্থক কমরেড মৃণাল পাল দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ৪ ফেব্রুয়ারি নিজ বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

কলকাতায় কৃষ্ণপুর রবীন্দ্রপল্লি এলাকায় বসবাস করার সময় তিনি এস ইউ সি আই (সি) দলকে সঠিক কমিউনিস্ট দল হিসাবে গ্রহণ করেন এবং দলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। তিনি বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকার কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য এবং আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি ছিলেন। তিনি ছিলেন মহিষবাথান কৃষ্ণপুর নাগরিক কমিটির সহসভাপতি। মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর বিভিন্ন কর্মসূচিতে যথাযথ সাহায্য করতেন তিনি। তাঁর অমায়িক ব্যবহার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানসিকতা, দরদি মনের জন্য পারিবারিক ক্ষেত্রে এবং এলাকার মানুষের কাছে তিনি শ্রদ্ধেয় ও প্রিয়জন হয়ে উঠেছিলেন। অসুস্থতা ও বয়সের বাধা অতিক্রম করেও তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা ছিল উল্লেখযোগ্য।

কমরেড মৃণাল পালের মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পরই দলের কর্মীরা এবং এলাকার বহুমানুষ তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হন। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন সহ সাধারণ মানুষ তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। মাল্যদান করেন দলের প্রবীণ সংগঠক অধ্যাপক প্রণব দাশগুপ্ত, আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড জগন্ময় কর্মকার সহ অন্যান্য কর্মীরা।

কমরেড মৃণাল পাল লাল সেলাম

মুর্শিদাবাদ জেলার পুরনো কর্মী কমরেড নিখিল মুখার্জী ২৮ জানুয়ারি ৬৩ বছর বয়সে বহরমপুর শহরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কমরেড নিখিল মুখার্জী সত্তর দশকের প্রথম দিকে কৃষ্ণনাথ কলেজে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র মাধ্যমে দলের সংস্পর্শে আসেন। ছাত্র সংসদে নির্বাচিত হয়ে তিনি গেম সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন কর্মোদ্যোগী এবং প্রাণোচ্ছল। দলের কোনও কমিটি বা গণসংগঠনের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও তিনি দলের বিভিন্ন সংকট মুহূর্তে, নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বহরমপুরে এম এস এস-এর বিগত রাজ্য সম্মেলনে, জেলায় দলের নতুন অফিস উদ্বোধন করার ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ঠিকাদারদের সরকারি বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন প্রশংসনীয়। ২০০০ সালে বন্যায় দলের ডাকে তিনি বহরমপুরের নলকূপগুলি শোধন করে শহরের মানুষের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুদায়িত্ব পালন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় পরিবারের সকলেই দলের সমর্থকে পরিণত হন। তাঁর স্মরণে ১৮ ফেব্রুয়ারি বহরমপুর শহরের দু'টি লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে লিয়াকৎ হলে স্মৃতিচারণ সভার আয়োজন করা হয়। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষাল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রতন কর্মকার। সভাপতিত্ব করেন জেলা সম্পাদক কমরেড সাধন রায়।

কমরেড নিখিল মুখার্জী লাল সেলাম

বিবেকানন্দ ও দীনদয়াল একাসনে!

বিজেপি একজন মহাপুরুষ সৃষ্টি করেছে। তাঁকে বিবেকানন্দ-লোকমান্য তিলক প্রমুখের পাশে বসিয়ে দিয়েছে এবং জোর গলায় প্রচার করছে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এঁদের সমকক্ষ। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তাঁর জন্মশতবর্ষ উদযাপন করেছে। নানা সরকারি প্রকল্পের নামকরণ তাঁর নামে করা হচ্ছে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে সমস্ত স্কুলে তাঁর জীবনী পড়ানো হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি সেন্ট্রাল হলে তাঁর ভাষণে মহাত্মা গান্ধীর সাথে দীনদয়াল উপাধ্যায়কে একাসনে বসিয়ে দিয়েছেন। সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে বিজেপি ও আরএসএস বেশ কোমর বেঁধেই আসরে নেমে পড়েছে। প্রশ্ন হল, দেশ-জাতি-সমাজ-সভ্যতার জন্য দীনদয়ালজির অবদান কী? দেশ যখন সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত তখন তাঁর ভূমিকা কী ছিল? দেশের মানুষের চিন্তা-ভাবনা-সংস্কৃতি-মূল্যবোধ বিকাশে তাঁর অবদান কী? নবজাগরণের যে আলো রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ-নেতাজি প্রমুখ মহান মনীষীরা এ দেশের বুকে জ্বেলেছিলেন তাকে আরও উজ্জ্বল, আরও দীপ্ত করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা কী? যদি এই সব ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা দেশের নবজাগরণের ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান সন্তানদের অনুসারী হয়, তবে দেশের কাছে জাতির কাছে তাঁর মূল্য অনেক। কিন্তু যদি দেখা যায়, চিন্তা ও কর্মের মধ্য দিয়ে নবজাগরণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান সন্তানদের শিক্ষার বিপরীতে হেঁটেছেন তিনি, তা হলে বিজেপির কাছে তাঁর যতই মূল্য থাকুক, দেশ-জাতি ও সভ্যতা তাঁকে মূল্য দেবে কেন?

দীনদয়ালজির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্ম ১৯১৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তৎকালীন যুক্তপ্রদেশের মথুরা জেলার চন্দ্রভান গ্রামে। ১৯৩৭ সালে তিনি বিএ পাশ করেন। ওই বছরই তিনি আরএসএস-এ যোগ দেন এবং এমএ পড়ার জন্য আগ্রায় যান। আরএসএস-এর কাজকর্মের সূত্রে এখানেই তাঁর সাথে পরিচয় হয় নানাজি দেশমুখের। আরএসএস-এর পূর্ণাঙ্গ সময়ের কর্মী হিসাবে তিনি ১৯৪২ সালে সংগঠনে যোগ দেন। জেলা সংগঠক হিসাবে তিনি উত্তরপ্রদেশের লখিমপুরে কাজ শুরু করেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট তিনি 'রাষ্ট্র ধর্ম' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তারপর প্রকাশ করেন সপ্তাহিক পত্রিকা 'পাঞ্চজন্য' এবং শেষে 'দৈনিক স্বদেশ'। ১৯৫১ সালের ২১ অক্টোবর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নেতৃত্বে জন্ম নেয় 'ভারতীয় জনসংঘ'। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এই দলের উত্তরপ্রদেশ শাখার সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং তারপর সর্বভারতীয় সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৩ সালে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলে সংগঠনের দায়িত্ব এসে পড়ে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের কাঁধে। ১৫ বছর তিনি এই দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৬৮ সালে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দীনদয়াল উপাধ্যায় ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

সংক্ষিপ্ত এই জীবনচিত্রে দেখা যাচ্ছে, ১৯৩৭ সালে পূর্ণ যুবক বয়সেই পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় আরএসএস-এ যোগ দিয়েছিলেন এবং ১৯৪২ সালে তিনি আরএসএস-এর সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কাজ শুরু করেছিলেন। সময়টা ছিল ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবজনক অধ্যায়। ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে তখন অসংখ্য মানুষ প্রাণ দিচ্ছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে একে একে শহিদের মৃত্যু বরণ করছেন ভগৎ সিং, রাজগুরু, শুকদেব, চন্দ্রশেখর আজাদ, প্রীতিলতা, সূর্য সেন প্রমুখ। লক্ষ লক্ষ মানুষকে গ্রেপ্তার করে জেলে ভরে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় নারীদের উপর নির্মম নির্যাতন চালাচ্ছে পুলিশ, স্বাধীনতাকামী জনগণ উত্তরপ্রদেশের বালিয়া ও বাংলার তমলুকে 'স্বাধীন সরকার' প্রতিষ্ঠা করেছে। দেশের পূর্ব প্রান্তে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে শুরু হয়েছে আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম। উদাত্ত কণ্ঠে নেতাজি আহ্বান জানাচ্ছেন 'গিভ মি ব্লাড, আই প্রমিস ইউ ফ্রিডম'। ১৯৪৬ সালে শুরু হয়েছে বোম্বের নৌ বিদ্রোহ। ব্রিটিশের গোলামখানা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে হাজার হাজার নৌ-সেনা। ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে তারা উড়িয়ে দিয়েছে স্বাধীন ভারতের পতাকা। গত শতাব্দীর চল্লিশের দশক এইভাবে অসংখ্য বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের উজ্জ্বল উদাহরণ সৃষ্টি করেছিল।

ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এই দিনগুলোতে তরুণ দীনদয়াল কী ভূমিকা পালন করেছিলেন? তিনি কি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন? না, তেমন কোনও ভূমিকা পালন করতে তাঁকে দেখা যায়নি। দেখা যায়নি কারণ, দীনদয়ালজি ও তাঁর সংগঠন আরএসএস মনে করত ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা উচিত নয়। এই কারণে তাঁরা ১৯৪০-'৪১-এর ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার এবং বোম্বাইয়ের নৌ বিদ্রোহকে ঘিরে ১৯৪৫-'৪৬-এর আন্দোলন সব কিছু থেকেই সচেতন ভাবে দূরে থেকেছেন। চেষ্টা করেছেন দেশের তরুণদের এই সংগ্রাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে কী চোখে দেখতেন আরএসএস নেতারা? এ প্রসঙ্গে আরএসএস-এর চিন্তানায়ক গোলওয়ালকরের বক্তব্য ছিল, 'স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেকগুলিই কার্যত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। ব্রিটিশ বিরোধিতাকে ভাবা হত দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের সমার্থক। এই প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলন, তার নেতৃবর্গ ও সাধারণ মানুষের উপর বিনাশকারী প্রভাব ফেলেছিল।" (চিন্তাচয়ন ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৫)। অর্থাৎ আরএসএস-এর মতে পরাধীন ভারতে 'ব্রিটিশ বিরোধিতা'কে দেশপ্রেম বলা ভুল হয়েছিল এবং এই প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির ফলে সাধারণ মানুষের উপর বিনাশকারী প্রভাব পড়েছিল। কিন্তু শুধু এটুকু বলেই আরএসএস থেমে যায়নি, 'নিয়মনীতি মেনেই সংঘ আইনের ঘেরাটোপের মধ্যে থেকে কাজকর্ম করেছে এবং বিশেষভাবে, ১৯৪২-এর আগস্ট মাসে যে গোলমাল হয়েছিল তাতে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছে।' (দ্য ব্রাদারহুড ইন স্যাফ্রন ঃ দি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ অ্যান্ড হিন্দু রিভাইভালিজম)।

১৯৪৩ সালের ২৯ এপ্রিল গোলওয়ালকর আরএসএস-এর সদস্যদের উদ্দেশে একটা নির্দেশাবলি জারি করেন। তাতে বলা হয়, "আমরা কুচকাওয়াজ ও ইউনিফর্ম সম্বন্ধে সরকারের আগের নির্দেশ মতো আমাদের কার্যক্রম বন্ধ রেখেছি ...যাতে আমাদের কার্যকলাপ আইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সময় বদলাতে পারে এই অপেক্ষায় না থেকে এখন আমরা স্থির করেছি যে ওই অংশটা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হবে।" অর্থাৎ ব্রিটিশ বিরোধিতা নয়, ব্রিটিশের সাথে সহযোগিতা— এই ছিল আরএসএস-এর ভূমিকা।

দীনদয়ালজি ছিলেন আরএসএস-এর একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রচারক। তিনি তো আরএসএস-এর এই চিন্তা, এই মতবাদই প্রচার করেছিলেন! তিনি প্রচার করেছিলেন, ব্রিটিশের বিরোধিতা নয়, ব্রিটিশের সাথে সহযোগিতা করা দরকার এবং এটাই ভারতবাসীর একমাত্র কর্তব্য। এই কাজ তিনি এত দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে করেছিলেন যে দ্রুত সংগঠনে তাঁর পদোন্নতি হয়েছিল। ১৯৪২ সালে একজন সাধারণ প্রচারক থেকে ১৯৪৭ সালে তিনি সংঘের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতায় পরিণত হয়েছিলেন। ফলে দীনদয়ালজি শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেননি তাই নয়, আরএসএস-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী, আরএসএস-এর অন্যান্য নেতাদের মতোই তিনিও ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছিলেন।

সব থেকে বড় কথা হল, এই জন্য তাঁর কোনও আত্মগ্লানি ছিল না। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ না দেওয়াকে যুক্তিসঙ্গত প্রতিপন্ন করতে গিয়ে দীনদয়ালজি বলছেন, 'এই ভ্রান্ত ধারণাই আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে আছে যে, বিদেশি শাসককে উচ্ছেদ করার মধ্যেই আমাদের স্বাধীনতা নিহিত। বিদেশি শাসনের বিরোধিতা মানে এই নয় যে, আমরা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে ব্রিটিশ বিরোধিতার উপরই বড় বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল। ভাবা হত যারাই ব্রিটিশের বিরোধিতা করছে তারাই দেশপ্রেমিক। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টির জন্য নিয়মিত প্রচার চালানো হত। বলা হত দেশের সমস্ত দুঃখ-দারিদ্র-যন্ত্রণার জন্য ব্রিটিশরাই দায়ী'। (সি পি ভিশিকার, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ঃ ইডিওলজি অ্যান্ড পারসেপশন ঃ কনসেপ্ট অফ দ্য স্টেট)।

এই ছিল দীনদয়ালজির সত্যকার মানসিকতা। 'বিদেশি শাসনের উচ্ছেদের মধ্যে আমাদের স্বাধীনতা নিহিত নয়', 'বিদেশি শাসনের বিরোধিতা মানে দেশপ্রেম নয়', 'দেশের দুঃখ-দুর্দশা যন্ত্রণার জন্য ব্রিটিশ শাসনই দায়ী', এ কথা বলা ভুল— এই ছিল দীনদয়ালজির মত। এই মতই তিনি দেশের মধ্যে প্রচার করেছেন। দেশের যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ সন্তানরা ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়েছেন, দেশের মুক্তির লক্ষ্যে নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেই রায় দিয়েছেন দীনদয়ালজি। এঁকে 'মহান' বলা যায়?

হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রসঙ্গে

ব্রিটিশ শাসকদের বন্ধুর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন— এটা পরিষ্কার, কিন্তু তা বলে কি তাঁরা সেই সময় চুপচাপ বসেছিলেন? না, এই অপবাদ দীনদয়ালজিদের দেওয়া যাবে না। তাঁরা মুসলমানদের কল্পিত অধীনতা থেকে হিন্দুদের মুক্ত করার জন্য প্রাণপণ প্রচার চালিয়েছিলেন। মুসলমানদের হুঁশিয়ারি দিয়ে গোলওয়ালকর সেই সময় বলেছিলেন, 'হিন্দুস্তানের অ-হিন্দু জনগণকে হয় হিন্দু সংস্কৃতি ও ভাষা গ্রহণ করতে হবে, হিন্দু ধর্মকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতে শিখতে হবে, হিন্দু জাতি এবং সংস্কৃতির প্রচার ব্যতীত অন্য কোনও ধারণা বর্জন করতে হবে... এক কথায়, তাদের হয় বিদেশি হয়ে থাকা বন্ধ করতে হবে অথবা তারা এ দেশে থাকতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে হিন্দু জাতির অধীনস্থ হয়ে, কোনও কিছু দাবি না করে, কোনও বিশেষ সুবিধার দাবিদার না হয়ে তো বটেই— এমনকী নাগরিক অধিকারের দাবিদার না হয়ে।' (উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড, পৃঃ৫৫-৫৬)। দীনদয়ালজির অভিমতও ছিল একই রকম। গোলওয়ালকরের মতো তাঁর মনোভাবও ছিল মুসলিম বিদ্বেষী চিন্তায় ভর্তি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "মুসলিম সম্প্রদায়ের দেশবিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব অখণ্ড ভারত গড়ে তোলার পথে সবচেয়ে বড় বাধা।... অখণ্ড ভারত সম্পর্কে যাদের সন্দেহ আছে তারা মনে করে মুসলমানরা এই মনোভাব পরিবর্তন করবে না। তাই যদি হয়, তবে ভারতে ছয় কোটি মুসলমানের অবস্থান ভারতের স্বার্থের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক হবে।" (সুধাকর রাজে সম্পাদিত পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রন্থ থেকে)। দীনদয়ালজি আরও বলেছেন, "ভারতের স্বাধীনতার পর, জনগণ, রাজনৈতিক দলগুলো এবং সরকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে ... কিন্তু মুসলিম সমস্যা হল সবচেয়ে পুরনো, সবচেয়ে জটিল। এই সমস্যা প্রতিদিন নতুন নতুন রূপ ধারণ করছে। বিগত বারোশো বছর ধরে আমরা এই সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি।" (বি এন জোগ, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ঃ ইডিওলজি অ্যান্ড পারসেপশন—পলিটিকস ফর নেশনস সেক)।

২০১৫ সালের অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে আরএসএস-এর মুখপত্র 'রাষ্ট্র ও ধর্ম'-তে একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধের শিরোনাম 'মুসলিম সমস্যা ঃ দীনদয়ালজির দৃষ্টিতে', লেখক ডঃ মহেশ চন্দ্র শর্মা। এই মহেশ চন্দ্র শর্মাই দীনদয়াল উপাধ্যায়ের রচনা সমগ্রের (১৫ খণ্ড) সম্পাদক। এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কলরাজ মিশ্র। প্রকাশ করতে গিয়ে কলরাজ মিশ্র বলেছেন, 'প্রবন্ধে যে সব ঘটনার কথা বলা হয়েছে আমি তার সাথে একমত।' প্রবন্ধে কী বলা হয়েছে? বলা হয়েছে, 'উপাধ্যায় এও বিশ্বাস করতেন ব্যক্তিগতভাবে একজন মুসলমান ভাল হতে পারে, কিন্তু দলগতভাবে সে খারাপ এবং আবার একজন হিন্দু ব্যক্তিগতভাবে খারাপ হতে পারে, কিন্তু দলগতভাবে সে ভাল।' 'উপাধ্যায় বলেছেন, মুসলমান হওয়ার পর একজন ব্যক্তি জাতীয় শত্রুতে পরিণত হন।' 'দেশের শাসন ক্ষমতা যদি এমন লোকের হাতে যায়, যারা কুতুবুদ্দিন, আলাউদ্দিন, মুহম্মদ তুঘলক, ফিরোজ শাহ-তুঘলক, শের শাহ, আকবর ও আওরঙ্গজেবের থেকে আলাদা না হয়, তবে বলতেই হবে তাদের ভালবাসার কেন্দ্রবিন্দু ভারতীয় জীবনধারা নয়।' এই হলেন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়। মুসলমানরা 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', 'মুসলমানরা জাতীয় শত্রু', 'ছয় কোটি মুসলমানের এ দেশে অবস্থান দেশের পক্ষে বিপজ্জনক'— এই ছিল দীনদয়ালজির চিন্তা। অথচ এ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ককে কী চোখে দেখেছেন? তাঁদের চোখে জাতীয় জীবনে ইসলামের গুরুত্ব কী?

জাতীয় জীবনে ইসলামের গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ভারতবর্ষে কেবল হিন্দু চিত্তকে স্বীকার করলে চলবে না। ভরতবর্ষে সাহিত্য-শিল্পকলা -স্থাপত্য বিজ্ঞান প্রভৃতিও হিন্দু-মুসলমানের সংমিশ্রণে বিচিত্র সৃষ্টি জেগে উঠেছে। তারই পরিচয়ে ভারতবর্ষীয়দের পূর্ণ পরিচয়।" (রচনাবলি, ১৪ খণ্ড, পৃ ঃ ২৫১) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বলেছেন— "মুসলমানেরা ভারতে তাদের নিজেদের বাসভূমি স্থাপন করেছে। তারা ভারতীয় জীবনে এক নতুন ও অদ্ভুত জীবনীশক্তি নিয়ে এসেছে। এই জীবনীশক্তির প্রয়োজন ছিল।" এ দেশের জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনার গুরুত্ব যে কতখানি তা আমরা বুঝতে পারি আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের আলোচনায়। তিনি লিখেছেন, "হিন্দু-মুসলমানের সাধনা এ দেশে এমন যুক্ত হইয়া গিয়াছে যে রচনা

সাতের পাতায় দেখুন

আন্তর্জাতিক ভেনেজুয়েলা দিবসের দাবি

যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া চলবে না

‘ভেনেজুয়েলায় যুদ্ধ নয়’— এই দাবি উঠছে খোদ মার্কিন জনগণের মধ্য থেকেই। মার্কিন নাগরিকরা তাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, তাদের সন্তানদেরকেই যুদ্ধবাজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের কামানের খোরাক হতে হয়। সেখানে গড়ে উঠেছে ‘নো ওয়ার অন ভেনেজুয়েলা’ ফোরাম। যার অন্যতম স্বাক্ষরকারী এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। ২৩ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভেনেজুয়েলা দিবস পালনের ডাক দিয়েছিল এই ফোরাম।

ওই দিন সারা বিশ্বেই নানা শহরে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মানুষ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রাস্তায় নামেন। ভারতে রাজধানী দিল্লি সহ সমস্ত রাজ্য রাজধানী ও গুরুত্বপূর্ণ শহরে বিক্ষোভ, মার্কিন রাষ্ট্রপতির কুশপুতুল দাহ ইত্যাদি কর্মসূচি পালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার বহু স্থানে ও সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শহর-গঞ্জে একই ধরনের বিক্ষোভ হয়।

সর্বত্রই পুলওয়ামায় নিহত জওয়ানদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে দাবি ওঠে, কী করে এই ঘটনা ঘটতে পারল তার তদন্ত করে গাফিলতির জন্য দায়ীদের শাস্তি দিতে হবে।

জয়নগরে ট্রাম্পের কুশপুতুলে অগ্নি সংযোগ করছেন পলিট বুরো সদস্য কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার

মুম্বাই, মহারাষ্ট্র

আগরতলা, ত্রিপুরা

অনন্তপুর, অন্ধ্রপ্রদেশ

শিয়ালদহ, কলকাতা

দু’পারের মৌলবাদীরা পরস্পর ভাল বন্ধু

কমিউনিস্ট পার্টি অব পাকিস্তান

সম্প্রতি সৌদি আরবের যুবরাজ মহম্মদ-বিন সলমন পাকিস্তান সফরে গিয়ে বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি অফ পাকিস্তানের (সিপিপি) পলিটব্যুরো ১৮ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেছে, সৌদির যুবরাজের পাকিস্তান সফর নিয়ে সংবাদমাধ্যমের বাড়াবাড়ি রকমের প্রচার দেখে মনে হতে পারে যেন তিনি পাকিস্তানের জন্য অচিন্তনীয় সব সৌভাগ্য এবং সমৃদ্ধি বয়ে এনেছেন। কিন্তু এ আশা দাঁড়িয়ে আছে ভ্রান্তি এবং বিভ্রমের ওপর। প্রচারের এই সমারোহ বিগত সরকারের আমলে চীনের রাষ্ট্রপতির সফর নিয়ে সমারোহকেই হুবহু মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু মানুষ এই প্রশ্ন করবেই যে, এই রকম নানা চুক্তি কি আদৌ কোনও অগ্রগতি, অর্থনীতিতে সুস্থিতি নিয়ে আসে? কিংবা পাকিস্তানি টাকার দাম একটুও বাড়তে সাহায্য করে? এর উত্তর হল— না।

সৌদিই হোক বা চীনই হোক তাদের কারও সাথে কোনও চুক্তি, মউ স্বাক্ষর কখনও দেশের উন্নয়ন, অগ্রগতি নিয়ে আসে না, জনগণের সমৃদ্ধিতে কোনও সাহায্য করে না। এ কাজ কিছুটা সম্ভব হত, সরকার এবং মিলিটারির বিপুল খরচ কমালে, নেতা-মন্ত্রীরা সরল জীবন যাপন করলে, দেশকে স্বনির্ভর করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হলে। দেশের সমৃদ্ধ কৃষিজমি রক্ষা করতে পারলে, শিল্পের দৈন্য কাটানোর ব্যবস্থা নিলে, তেল-গ্যাস সহ সমস্ত খনি জাতীয়করণের মতো কাজগুলি করলে তা জনগণের উন্নতি ও দেশের অগ্রগতিতে কাজে লাগত। কিন্তু এর বদলে সরকার দেশের সমস্ত সম্পদ জলের দরে বিদেশিদের হাতে বেচে দিচ্ছে। সৌদি যুবরাজের সফরের গোপন উদ্দেশ্যটি আসলে কী ছিল তা নিয়ে বিবৃতিতে গুরুতর আশঙ্কা ব্যক্ত করে সিপিপি বলেছে, সৌদি যুবরাজ যে ভাবে ইরানের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন, তার সাথে মিলিয়ে পাক-সৌদি বিদেশমন্ত্রীর যৌথ ঘোষণাপত্র দেখলেই তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

একদল পাকিস্তানি সেনাকে সৌদি আরবে মোতায়েন করা হয়েছে এবং পাকিস্তানের সেনা বাহিনীর প্রাক্তন প্রধান রাহিল শরিফ বর্তমানে সৌদি রাজপরিবারের হয়ে কাজ করছেন। সৌদি-মার্কিন চক্রের সাথে ইরানের দ্বন্দ্ব গভীর হলে ইরানের শাসক পরিবর্তনের কাজে পাকিস্তানের এই বাহিনীকে লাগানো হবে বলে অনেকেই মনে করেন। এই সংকটময় মুহূর্তে পাকিস্তানকে যাতে নতুন করে সাম্রাজ্যবাদীদের দস্যুবৃত্তির কাজে ব্যবহার করা না যায় তা নিশ্চিত করতে সে দেশের জনগণকে এগিয়ে আসার জন্য সিপিপি আবেদন জানিয়েছে। তারা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে কীভাবে আফগানিস্তানের গণ-বিপ্লবী সরকারকে উচ্ছেদ করার জঘন্য কাজে সাম্রাজ্যবাদীরা একসময় পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী জেহাদিদের বেসক্যাম্পে পরিণত করেছিল। সৌদি আরব, তাদের পশ্চিমী দোসরদের অর্থানুকূল্য এবং পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও মার্কিন মদতেই এ জিনিস ঘটতে পেরেছে বলে সিপিপি দৃঢ় অভিমত জানিয়েছে।

কাশ্মীরের পুলওয়ামায় সিআরপিএফ জওয়ানদের উপর সন্ত্রাসবাদী হামলার তীব্র নিন্দা করে সিপিপি বলেছে— সন্ত্রাস এবং নিরীহ মানুষের হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে পাকিস্তান সরকারকে তার রাষ্ট্র-বহির্ভূত কর্মকর্তাদের উপর লাগাম পরাতে হবে। একই সাথে ভারত সরকারকেও সে দেশে ক্রমবর্ধমান ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। তা না হলে ভারতও যদি আর একটি পাকিস্তানে পরিণত হয়— তা হবে অতি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা।

সিপিপি বলেছে, কোনও সন্দেহ নেই যে, জইশ-ই-মহম্মদ আগামী নির্বাচনে বিজেপির ভোটব্যাঙ্ক শক্তিশালী করার কাজে দারুণ সাহায্য করেছে। পাকিস্তান-ভারত সীমান্তের দু’পারেই ধর্মের জিগির তোলা জঙ্গি মৌলবাদীরা পরস্পরের ভাল বন্ধু। একের বিপদে অন্যজন তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসে। (ই মেলে প্রাপ্ত)

মেডিকেল ছাত্রদের সমস্যা নিয়ে কর্ণাটকে লাগাতার আন্দোলন

মেডিকেল কলেজগুলিতে প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য আসন সংরক্ষণের বিরুদ্ধে এবং লাখ লাখ টাকায় মেডিকেলের আসন বিক্রির প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও-র নেতৃত্বে এক মাস ধরে কর্ণাটকে আন্দোলন চলছে। দলমত নির্বিশেষে সকল ছাত্রদের নিয়ে গড়ে উঠেছে মেডিকেল স্টুডেন্টস স্ট্রাগল কমিটি, ডেন্টাল স্টুডেন্টস স্ট্রাগল কমিটি। এদের সাথে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি এবং এ আই ডি এস ও যুক্ত হয়ে ৯ ফেব্রুয়ারি বাঙ্গালোরের কে জি এস ক্লাবে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্য অতিথি, কর্ণাটকের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল অধ্যাপক রবি ভার্মা বলেন, মেডিকেলে এন আর আই কোটা দেশের স্বার্থ বিরোধী এবং অসাংবিধানিক। এর তীব্র প্রতিবাদ করা উচিত। তাঁর বক্তব্য, দেশের মানুষের ট্যাক্সের টাকায় মেডিকেল কলেজ গড়ে উঠেছে, সেখানে বিদেশিদের জন্য আসন সংরক্ষণ কেন? টাকার জোরে এর সুযোগ নিচ্ছে একমাত্র ধনীরা। এটা সাধারণ ছাত্রদের স্বার্থবিরোধী, মেধার বিরোধী।

আই এম এ-র রাজ্য সভাপতি ডাঃ মধুসূদন করিগনুর এন আর আই কোটার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে বলেন, টাকার ভিত্তিতে মেডিকেলের মতো শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হলে ডাক্তারদের মধ্যে সামাজিক এবং নৈতিক দায়িত্ববোধ গড়ে উঠবে না। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন ডাঃ সুধা কামাথ (এম এস সি), কে উমা প্রমুখ। আন্দোলন পরিচালনার জন্য এ আই ডি এস ও-র সভাপতি ডাঃ প্রমোদকে আহ্বায়ক করে স্ট্রাগল কমিটি গঠিত হয়।

এনআরসি-র নামে হয়রানির প্রতিবাদে আসামে বিক্ষোভ

কাছাড়

এন আর সি-র চূড়ান্ত খসড়ায় নাম রয়েছে। তবুও ভেরিফিকেশনের জন্য দূরদূরান্তের সরকারি অফিসে ডেকে পাঠানো হয়েছে। এন আর সি-তে যাঁদের নাম অন্তর্ভুক্তি নানা অছিলায় আটকে দেওয়া হয়েছে হয়রানির শিকার শুধু তারাই নন, যাঁদের নাম রয়েছে তাঁরাও। আসামে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীদের সুরে সুর মিলিয়ে একটা বিরাট অংশের প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকের জীবন তছনছ করে দিচ্ছে। সরকার শুধু এন আর সি-র জাঁতাকলেই জনজীবনকে পিষছে না, জনজীবন পিষ্ট হচ্ছে অপশাসনেও। বরাক উপত্যকায় ৫০ লক্ষ জনগণের চিকিৎসার একমাত্র হাসপাতাল শিলচর মেডিকেল কলেজ। স্থাপনের ৫০ বছর পরেও সেখানে নিউরোলজি, নেফ্রোলজি, ইউরোলজি বিভাগ চালু হল না। বরাক উপত্যকার একমাত্র ভারি শিল্প পাঁচগ্রাম কাগজ কল দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। খোলার কোনও উদ্যোগ নেই।

এই অবস্থায় জনজীবনের সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে এস ইউ সি আই (সি) কাছাড় জেলা কমিটি। উক্ত সমস্যাগুলির সমাধান ছাড়াও অবিলম্বে প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু, স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ, চাষিদের সার-বীজ-কীটনাশক স্বল্প মূল্যে প্রদান, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, চাষির ফসলের সহায়ক দাম, শিলচর-সৌরাষ্ট্র মহাসড়কের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা, ভূমিহীনদের পাট্টা প্রদান, বরাক উপত্যকার চা-শ্রমিকদের মজুরি অন্তত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সমান করা, মদ-জুয়া-সাট্টা-অশ্লীলতার প্রসার রোধ, বেকারদের কর্মসংস্থান ইত্যাদি দাবিতে ২২ ফেব্রুয়ারি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল জেলা উপায়ুক্তের দপ্তরে যায় এবং মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে দাবিপত্র পেশ করা হয়। বিক্ষোভ সভায় জেলা সম্পাদক কমরেড ভবতোষ চক্রবর্তী বলেন, 'নির্বাচন এলে কংগ্রেস, বিজেপির নেতারা প্রতিশ্রুতি দেন, জনগণের সব সমস্যা সমাধান করে দেওয়ার। কিন্তু নির্বাচনে জয়ী হয়েই প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলে যান। ক্ষোভের সাথে বলেন, সরকারি হিসাবে রাজ্যে ২২ লক্ষ বেকার। কর্মসংস্থানের সুসংহত কোনও ব্যবস্থাই করছে না পরের পর সরকার। তিনি বলেন, আন্দোলন করেই হকের পাওনা আদায় করতে হবে।

শিক্ষার দাবিতে সোচ্চার সেভ এডুকেশন কমিটি

২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করল অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির তমলুক শাখা। সকালে তাম্রলিপ্ত পৌরসভার সামনে শহিদ বেদিতে মাল্যদান, কবিতা পাঠ, আলোচনা সভার মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করে এই সংগঠন। উপস্থিত ছিলেন কবি দেবপ্রসাদ দত্ত, কবি কৃষ্ণপ্রসাদ মাজী, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক প্রশান্ত পাড়ই, সাহিত্যিক তপন জানা প্রমুখ। সেভ এডুকেশন কমিটির জেলা সম্পাদক শিক্ষক শুভেন্দু দাস বলেন, বর্তমান শিক্ষাবর্ষেই পাশ-ফেল প্রথা চালু, বিজ্ঞানভিত্তিক সিলেবাস, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু সহ নানা দাবিতে জেলার তমলুক, কাঁথি, পাঁশকুড়া সহ বিভিন্ন স্থানে যাথাযোগ্য মর্যাদায় দিনটি পালিত হয়।

ভোপালে জনজীবনের দাবি নিয়ে বিশাল মিছিল

১৮ ফেব্রুয়ারি এক বিশাল গণমিছিল অনুষ্ঠিত হল মধ্যপ্রদেশের ভোপালে। আশা কর্মীদের কর্মচারী হিসাবে স্বীকৃতি, মাসিক ২১ হাজার টাকা বেতন, মদ বিক্রি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা, প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু, শূন্যপদে নিয়োগ প্রভৃতি দাবিতে এবং সরকারি স্কুলগুলির সংযুক্তি এবং বন্ধ করার প্রতিবাদে ছাত্র-যুবক-মহিলা কর্মচারী সহ নানা অংশের মানুষ সামিল হয়েছিলেন। ভোপাল, গুনা, আলিরাজপুর, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, দেওয়াম, অশোকনগর, রেইসেন, শিকপুরি, সাগর, জবলপুর, বিদিশা থেকে শত শত মানুষ এসেছিলেন।

প্যারামেডিকেল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের বিক্ষোভ

১৯ ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্যভবনে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার ও অল বেঙ্গল প্যারামেডিকেল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন বিক্ষোভ দেখায়। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্ত ও মেডিকেল কলেজ থেকে আগত প্যারামেডিকেল ছাত্রছাত্রী ও মেডিকেল টেকনোলজিস্টরা।

সমস্ত সরকারি ডায়াগনস্টিক ইউনিটগুলির পরিকাঠামোর উন্নয়ন, নিয়মিত ডায়ালিসিস, ও টি, ডি ও পি টি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের রিক্রুট করা, সরকারি হাসপাতালে পি পি পি মডেল বাতিল এবং স্বচ্ছ নিয়োগের দাবিতেই ছিল এই বিক্ষোভ। উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের কলকাতা জেলা সম্পাদক ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র, ডাঃ দীপক গিরি, ডাঃ অমিত ধবল, ডাঃ অনুপম ভট্টাচার্য, ডাঃ কবিউল হক প্রমুখ।

প্রতাপপুরে বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলন

১৬ ফেব্রুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রতাপপুর গ্রুপ সাপ্লাই বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। কয়লার দাম ৪৭ শতাংশ কমার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুতের দাম অর্ধেক কমানো, কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিদ্যুৎ আইন সংশোধনী-২০১৮ বাতিল সহ বিদ্যুতের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন জেলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক জয়মোহন পাল, সম্পাদক শংকর হালদার, অশোক ঘোষ প্রমুখ। সম্মেলন থেকে সিরাজ খাঁনকে সভাপতি, অমিত মান্না, বিদ্যুৎ সামন্তকে যুগ্ম সম্পাদক, নিলয় খালুয়াকে কোষাধ্যক্ষ করে গ্রুপ সাপ্লাই গ্রাহক সমিতি গঠিত হয়।

নিকাশি সমস্যার সমাধানে বিডিও ডেপুটেশন

পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট ব্লকের দেড়িয়াচক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ব্যাপকভাবে গড়ে উঠেছে বেআইনি মাছের ঝিল। ফলে এলাকার শয়ে শয়ে বিঘা জমির জল নিকাশির পথ বন্ধ হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে দেড়িয়াচক ও ভোগপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঝোকুড়কুল, কুমরচক, বাঙ্গালপুর, নন্দাইসাজিন এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা দেড়িয়াচক অঞ্চল কৃষি উন্নয়ন কমিটি গড়ে তুলে আন্দোলন শুরু করেছেন। তারা ক্ষতিগ্রস্তদের গণস্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি ১৩ ফেব্রুয়ারি কোলাঘাট ব্লকের বি ডি ও কে দিয়েছেন। বিডিও এ মাসেই ইঞ্জিনিয়ারদের পাঠিয়ে সরেজমিন পরিদর্শন করা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

অ্যাবেকার পুরুলিয়া জেলা সম্মেলন

১৭ ফেব্রুয়ারি পুরুলিয়া শহরে অনুষ্ঠিত হল অ্যাবেকার জেলা সম্মেলন। জঙ্গলমহল এলাকায় ৩/৪ বছর ধরে মিটার রিডিং না নিয়েই যেমন খুশি বিল পাঠানো হচ্ছে এবং তার পরিমাণ হাজার হাজার টাকা। স্বাভাবিকভাবেই এই টাকা গ্রাহকদের পক্ষে মেটানো সম্ভব হয়নি। এই অবস্থায় বকেয়ার অজুহাতে লাইন কেটে দেওয়া হচ্ছে। বিদ্যুৎ দপ্তরের এই খামখেয়ালিপনার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে অ্যাবেকার পুরুলিয়া জেলা শাখা। এ দিনের সম্মেলনে জেলার ১৭টি ব্লক থেকে গ্রাহকরা এসেছিলেন।

দাবি ওঠে, জঙ্গলমহলের ভুতুড়ে বিলগুলি বাতিল করতে হবে, ৫০ শতাংশ মাশুল কমাতে হবে এবং জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন-২০১৮ বাতিল করতে হবে। সংগঠনের রাজ্য সহসভাপতি অমল মাইতি, রাজ্য সম্পাদক প্রদ্যোৎ চৌধুরী ও বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক স্বপন নাগ উপস্থিত ছিলেন। প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ চ্যাটার্জীকে সভাপতি এবং গৌতম হাটিকে সম্পাদক করে নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়।

পাঠকের মতামত

যুদ্ধ চাই

মান থাকে না, চালাও কামান
বিমান হানাও দরকারি,
মরে মরুক পড়ুক লাশ
আদেশ যখন সরকারি।

সীমান্তে দুই দেশপ্রেমিক
যুদ্ধযুদ্ধতাদের বাই,
বোকায় বলে 'মারিস কারে
হতে পারে তোরই ভাই।

সরকারি কান শুনতে না পায়
যুদ্ধবাজার চাঙ্গা যে,
আর দেরি নয় নাই সংশয়
শত্রু নিধন আন্দাজে।

কেউ বা বলে ভাবছো কী হে,
কেমন তুমি বেআক্কেল?
বাজার এখন গরমাগরম
চালাও লড়াই সার্জিকাল।

পাড়ার মোড়ে হাত পা নেড়ে
কে যেন রে যুদ্ধ চায়?
বুদ্ধ অশোক শোকে পাথর
আমজনতা লজ্জা পায়।

নুন আনতে পান্তা ফুরায়
তারও বড় যুদ্ধেসুখ
যুদ্ধ এখন পথে ঘাটে
যুদ্ধ এখন সর্বভুক।

ভোট মরশুম চলবে নিঝুম
হামলা যখন সীমান্তে
কোলের ছেলে আস্তে কাঁদিস
ভাত জোটে না দিনান্তে।

নেতায় নেতায় ভরবে উঠান
পরবে মালা বীর শহিদ,
যুদ্ধবড় দরকারি ভাই
পুঁজিবাদের শক্ত ভীত।

দেশপ্রেমের বইছে বাতাস
আসছে বুঝি আচ্ছে দিন
বাড়ুক বেকার থাক হাহাকার,
যুদ্ধ রঙে সব রঙিন।

দয়াময় ব্যানার্জী
রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া

ভারাক্রান্ত মনে শীতল বাতাস

৩ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক আবহ খুবই সরগরম ছিল। বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেল মাল্টি ক্যাম সম্প্রচার চলছে-'বামফ্রন্টের বিগ্রেড'। বিগ্রেডে কত লোক আসছে? কীভাবে আসছে? বিগ্রেডের কোন জায়গটা ফাঁকা পড়ে আছে? কীভাবে সেই শূন্যস্থান পূরণ হবে! তার বিস্তারিত বিবরণ শুনলেন রাজ্যবাসী। নির্ধারিত নয়জন বক্তার প্রত্যেকেই প্রায় এক সুরে 'বিকল্পে'র কথা বলে গেলেন, বললেন 'বিকল্প নীতি' বাস্তবায়নের কথা, কিন্তু কী সেই 'বিকল্প নীতি'? সেই নীতির অভিমুখটাই বা কী? এর কোনও স্পষ্ট উত্তর সেদিন পাইনি, বরং আর পাঁচটা সংসদীয় দলের মতোই নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য যেভাবে প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়-তাই-ই সেদিন দিয়েছেন নেতারা। ফলে প্রাপ্তির ভাঁড়ার শূন্য থেকেছে বেশিরভাগ বাম মনোভাবাপন্ন মানুষের। এই নিয়ে মন যখন ভারাক্রান্ত, মনে একটু শীতল বাতাস দিয়ে গেল গণদাবী'র (৭১/২৭) সংখ্যায় মুদ্রিত একটি নিবন্ধ 'কোন বিকল্পের কথা বলছেন কমরেড'! এই নিবন্ধটিতে খুব যথোচিতভাবে সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন তোলা হয়েছে...''দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় বামফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সরকার চালিয়েছে। রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজ-সংস্কৃতি কোন ক্ষেত্রে কী বিকল্পের তারা চর্চা করেছিলেন? পশ্চিমবঙ্গ কে কোন বিকল্পের সন্ধান তাঁরা দিয়েছিলেন? এখন যদি তাঁরা সরকার গঠনের আওয়াজ তুলে বিকল্পের কথা বলেন, তবে তো প্রশ্ন উঠবেই। 'গণদাবী' খুব সঠিকভাবেই জনসাধারণের মতকে প্রতিফলিত করছে এই নিবন্ধে যে "...এখন এই রাজ্যের মানুষ হিসাব করে, গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক পরিবেশকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে কে এগিয়ে বামফ্রন্ট না তৃণমূল? কুকর্মে কে কম বা কে বেশি?" এই বক্তব্যের সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ সৎ বামপন্থীরাও সহমত যে, "...ক্ষমতাসীন এক সরকারকে হঠিয়ে বামপন্থীরা বেশি আসন দখল করলেই বামপন্থার জয়? এই রাজনীতির চর্চা করে বামপন্থার অনেক সর্বনাশ করেছেন কমরেড, এবার থামুন। ভোটসর্বস্ব রাজনীতি করছেন করুন—দোহাই, তাকে বামপন্থা বলবেন না।"

নিবন্ধের মর্মবস্তুকে উপলব্ধি করলে যে সরল সত্যটি প্রস্ফুটিত হয় তা হল বামপন্থাকে নিছক ভোটের বিকল্প না বানিয়ে সংগ্রামী বামপন্থার ঝান্ডাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরাটাই আজ কর্তব্য।

সৌপ্তিক পাল
কলকাতা

মাধ্যমিকে ছাত্র সংখ্যা কমার দায় সরকারি নীতির

এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ১৮ হাজার কম। কারণ হিসাবে জন্মহার কমে যাওয়ার কথা বলেছেন মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি। এর সাথে তিনি আরও একটা অদ্ভুত কথা বলেছেন, যেহেতু পাশের হার বাড়ছে, সে-কারণেও পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে। প্রসঙ্গত ২০১৭ সালেও তার আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৭৫ হাজার পরীক্ষার্থী কম ছিল।

সরকারি তথ্যই কিন্তু তাঁর কথার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে। ২০০৯ সালে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল প্রায় ২৬ লক্ষ শিক্ষার্থী। ২০১৯-এ মাধ্যমিকে বসছে সাড়ে ১০ লক্ষের একটু বেশি। শুধু তাই নয়, এই ২৬ লক্ষের মধ্যে পঞ্চম শ্রেণিতেই উঠেছিল মাত্র ১৬ লক্ষের কিছু বেশি। অর্থাৎ পাশ-ফেল না থাকা সত্ত্বেও প্রাথমিক স্তরেই ড্রপআউট হয়েছে প্রায় ১০ লক্ষ। বাকি ৫ লক্ষের বেশি শিক্ষার্থী স্কুল ছেড়েছে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির মধ্যে। এমনটা ঘটল কি জন্মহার কমার কারণে?

পর্ষদ সভাপতি জন্মহার হ্রাসের যে-কথা বলেছেন সেই কথারই বা ভিত্তি কী? ২০১১-র সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ২০০১ সালে রাজ্যের জনসংখ্যা ছিল ৮.০২ কোটি এবং ২০১১ সালে তা হয়েছে ৯.১৩ কোটি। তাহলে জন্মহার কমার কথাটা আসছে কোত্থেকে? মাধ্যমিক পর্ষদ সভাপতির মতো পদে যিনি আছেন, তাঁর কথার একটা ভিত্তি থাকতে হবে তো!

দ্বিতীয়ত, গত বছর পাশের হার বৃদ্ধির সাথে এবছর পরীক্ষার্থী কমার সম্পর্ক প্রমাণ করতে হলে সভাপতিকে স্পষ্ট তথ্য পেশ করতে হত। তাও তিনি করেননি।

কেন মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ পরীক্ষার্থী কমার কারণ হিসাবে এরকম ভিত্তিহীন মন্তব্যের আশ্রয় নিলেন? স্বভাবতই, প্রকৃত কারণটা গোপন করার জন্য। বস্তুত, শিক্ষাব্যবস্থার পরিকাঠামোর চরম বেহাল দশা, জনগণের প্রবল দারিদ্র ইত্যাদির সাথে পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার ফলে আরও বিপুল হারে বাড়ছে স্কুলছুটের সংখ্যা। এই কারণেই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমছে। এই সমস্যাকে সমাধানের উদ্যোগ না নিয়ে, তাকে আড়াল করলে কার ক্ষতি, রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদেরই নয় কি? কিন্তু এ কথা ভাবলে তাঁর চলবে কেন? সরকারি দলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন এবং কর্তাভজা হওয়াটাই আজ এই রাজ্যে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা প্রশাসনের মাথায় বসার যোগ্যতার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাধ্যমিক পর্ষদ সভাপতি তার অন্যথা করার ঝুঁকি নেবেন কী করে? সিপিএম সরকারের আমল থেকেই এ রাজ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে রোগ চেপে বসেছে তার নাম দলবাজি আর স্বজন পোষণ। তৃণমূল সরকারও সেই ধারাই বজায় রেখেছে। সে রোগে দুর্বল না হয়ে শিক্ষার ভাল চাইলে, পর্ষদ সভাপতিকেও সর্বনাশা সরকারি নীতির বিরোধিতাই করতে হবে।

মাটি চাপা পড়ে ছাত্রী-মৃত্যু দোষীদের শাস্তির দাবি

১৭ ফেব্রুয়ারি বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের ব্লকের দ্বারকেশ্বর নদী ঘেঁষা আখড়াশোল গ্রামের হতদরিদ্র মেটে পাড়ায় রাস্তার পাশে ঠিকাদারের খোঁড়া গভীর গর্তে মাটি ধসে ৫ জন স্কুল ছাত্রী চাপা পড়লে গ্রামের লোকজন তৎপরতার সাথে উদ্ধার কাজে নামেন। কিন্তু ঘটনাস্থলেই ৩ জনের মৃত্যু ঘটে। গুরুতর আহত দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এসইউসিআই(সি)-র জেলা কমিটির সদস্য স্বপন নাগ সহ কমরেড হরিপদ সরেন, কমরেড ধূমল সরেন ঘটনাস্থলে গিয়ে শোকার্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ান এবং গভীর সহানুভূতি জানান। হাসপাতালে আহত ছাত্রীদের যাতে সুচিকিৎসা হয় সে জন্য চিকিৎসকদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। পার্টির পক্ষ থেকে পাত্রসায়ের ব্লকে বিডিও এবং বাঁকুড়া জেলাশাসকের কাছে ২১ ফেব্রুয়ারি স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

দুই ছাত্রীর মৃত্যুর তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ঠিকাদারকে কঠোর শাস্তি, দুর্ঘটনাগ্রস্ত অতি গরিব খেতমজুর পরিবারগুলিকে ১৩ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ও প্রতি পরিবারে স্থায়ী চাকরি, চিকিৎসাধীন ছাত্রীদের গুরুত্ব সহকারে চিকিৎসা, মেটে পাড়ার গভীর গর্তের নালাকে অবিলম্বে ভরাট প্রভৃতি দাবিতে পাত্রসায়ের ব্লকে ডেপুটেশন দেন কমরেডস স্বপন নাগ, ধূমল সরেন ও হরিপদ সরেন। বিডিও প্রতিনিধিদের বলেন, আপনারাই এই দাবিগুলি তুললেন। তিনি অতি দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থার আশ্বাস দেন। জেলাশসকের কাছে স্মারকলিপি দেন কমরেডস স্বপন নাগ, শিশির কোলে ও হরিদাস ব্যানার্জী।

কার্পেট কারখানায় মৃত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ ও তদন্তের দাবি

উত্তরপ্রদেশের ভাদোহি জেলার চৌরিতে কার্পেট কারখানায় বিস্ফোরণে মালদা জেলার নয় শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে। দলের মালদা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে মানিকচক থানার এনায়েতপুর গ্রামের মৃত শ্রমিকদের পরিবারগুলোর সাথে সাক্ষাৎ করে সমবেদনা জানানো হয়। জেলা সম্পাদক কমরেড গৌতম সরকারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ২৪ ফেব্রুয়ারি মালদা জেলাশাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি দেন। তাতে মৃত শ্রমিকদের পরিবারকে ন্যূনতম ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ, মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে বিচারবিভাগীয় তদন্ত করে কঠোর শাস্তি এবং রাজ্যে সমস্ত শ্রমিকদের কাজ পাওয়ার মতো উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে ন্যায্য মজুরিতে কাজের ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়।

সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের সভা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারী ও পেনশনারদের জন্য হেলথ স্কিম চালু হয়েছে ২০০৮ সালে। বর্তমান সরকারের আমলে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এই স্কিমে চিকিৎসা খরচ পেতে কর্মচারী পেনশনারদের নানা অপ্রত্যাশিত সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

এই বিষয়ে ২২ ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্য ভবনের কনফারেন্স হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারি ইউনিয়ন এক সভার আয়োজন করে। উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিম অথরিটির প্রথম কনভেনর মেম্বার মহম্মদ জহিরুদ্দিন মোল্লা। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক শুভাশীষ দাস ও কলকাতা জেলা সম্পাদক সন্তোষ মহন্ত। বক্তারা বলেন, চিকিৎসা খরচ পেতে ৩-৪ বছর লেগে যাচ্ছে, অথচ সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে চিকিৎসা খরচ মিটিয়ে দেওয়ার সংস্থান স্কিমে আছে, চুক্তিবদ্ধ হাসপাতালগুলি চুক্তি অনুযায়ী পরিষেবা দিচ্ছে না বা ক্যাশলেস পরিষেবা দিচ্ছে না, ফলে কর্মচারীরা ক্ষতি ও হয়রানির শিকার হচ্ছেন, স্কিম অনুযায়ী কর্মচারীদের সচেতন করার কথা সরকারেরই। সরকার সে দায়িত্ব পালন করছে না। বিষয়গুলি নিয়ে কর্মচারীদের সংগঠিতভাবে সরকারের কাছে দাবি করার আহ্বান জানানো হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে।

১৬ ফেব্রুয়ারি এলাকায় মদের দোকান বন্ধের দাবিতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মথুরাপুর থানার কৃষ্ণচন্দ্রপুরে রাস্তা অবরোধ করেন স্থানীয় অধিবাসীরা। অন্ধমুনিতলার মদের দোকান সহ এলাকার সমস্ত দোকান বন্ধ করার দাবি তোলা হয়। এই উপলক্ষে ওই দিনেই এলাকায় নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

বিবেকানন্দ ও দীনদয়াল

তিনের পাতার পর

দেখিয়া লেখক হিন্দু কি মুসলিম তাহা বলা অসম্ভব। দরাব খাঁর রচিত সংস্কৃত গঙ্গা স্তব তো অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণেরও নিত্যপাঠ্য।"

"সেতার যন্ত্রটি হিন্দু-মুসলমান দুই যন্ত্রের সমন্বয়ে। এসরাজ, সুরবাহার, সারেঙ্গী প্রভৃতি হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনার ফল। তবলাও তাই। রামপুরের নবাব কলব আলী খাঁ সুরশৃঙ্গার প্রবর্তন করেন।"

"হিন্দু মুসলমান উভয় সাধনাতেই রসিক ও প্রেমিকেরা পরস্পর পরস্পরকে সহায়তা করিয়াছেন। কিন্তু যত বিপদ বাধাইয়াছেন ধর্ম-ব্যবসায়ীর দল। কবীর বলিয়াছেন, স্বয়ং ভগবানও ধর্ম-ব্যবসায়ীদের ভয় পান।" এই হল ভারতীয় সভ্যতার সত্যকার পরিচয়। এখানে, আর্য-অনার্য, শক-হূন-পাঠান-মোগল এসে এক দেহে লীন হয়েছে— সৃষ্টি হয়েছে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির। একইভাবে মধ্যযুগেও ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা এ দেশের সভ্যতা সংস্কৃতিকে পুষ্ট করেছে। গৌরবময় এই অধ্যায়কেই আধুনিক ধর্ম-ব্যবসায়ীরা অস্বীকার করেন, ইতিহাসকে বিকৃত করেন। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় নিজেকে এই আধুনিক ধর্ম-ব্যবসায়ীদের অন্যতম প্রধান প্রবক্তায় পরিণত করেছিলেন এবং এইভাবে নবজাগরণের মূল প্রবাহের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন— ঐতিহাসিক এই সত্যকে কোনওমতেই অস্বীকার করা যাবে না। সুকৌশলে কেন্দ্রীয় সরকার স্বামী বিবেকানন্দের নামের সাথে পণ্ডিত দীনদয়ালের নাম জুড়ে দিয়েছে। পণ্ডিত দীনদয়ালের জন্মশতবার্ষিকীতেই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার ১২৫ বছর। এই দুটো উপলক্ষকে এক সাথে জুড়ে দিয়ে 'স্টুডেন্টস লিডার্স কনভেনশনে' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভাষণ দিয়েছেন এবং ইউ জি সি-কে বলা হয়েছে দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় যেন এই বক্তৃতা শোনানোর ব্যবস্থা করে তা দেখতে। ইউ জি সি-ও তার ত্রুটি করেনি। তারা উপাচার্যদের নির্দেশ পাঠিয়েছে যেন উপযুক্ত জায়গায় টিভি বা প্রজেক্টর বসিয়ে অনুষ্ঠান শোনানোর ব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্র ও শিক্ষকের মনের মধ্যে বিবেকানন্দের পাশে দীনদয়ালকে বসিয়ে দেওয়ার সরকারি আয়োজন করা হয়েছে।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে দীনদয়ালের ভূমিকা, হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক ও ঐক্য প্রসঙ্গে তাঁর চিন্তার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। আমরা দেখিয়েছি ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে তিনি অংশগ্রহণ করেননি, এমনকী ব্রিটিশ বিরোধিতাকে তিনি দেশপ্রেম বলেও মনে করতেন না। আবার মুসলমানদের সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সাম্প্রদায়িক বিশ্বাসে ভরা। এই ধরনের একজন মানুষকে স্বামী বিবেকানন্দের সমকক্ষ তো দূরের কথা একজন সামান্য অনুগামীও বলা যায় না। চিন্তায়-কর্মে-আচার-আচরণে-লক্ষ্যে — সবদিক দিয়েই তিনি ছিলেন বিবেকানন্দ চিন্তার ঘোরতর বিরোধী। এ দেশে বহু বিপ্লবী কর্মী ছিলেন যাঁরা বিবেকানন্দ চিন্তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ বলেছেন, "ভারতমাতা, বন্দেমাতরম এবং স্বামী বিবেকানন্দ, এই তিনটি আমাদের মন্ত্র ছিল। এই তিনটি সত্যের পতাকা নিয়েই আমরা চলেছি— চলেছে বিনয়-বাদল-দীনেশ " (বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, খণ্ড-৬, পৃ ঃ ১৬২)। চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস বিবেকানন্দ সম্পর্কে আবেগ ভরে লিখেছেন— "হি ইজ দ্য মরাল ফোর্স অফ ইন্ডিয়া"। দীনবন্ধু এন্ড্রুজ লিখছেন, "বিবেকানন্দ ইন্টারপিড প্যাট্রিয়টিজম গেভ এ নিউ কালার টু দ্য ন্যাশনাল মুভমেন্ট থ্রু আউট ইন্ডিয়া। দ্য মঙ্ক অ্যান্ড দ্য প্যাট্রিয়ট ওয়্যার কিউরিয়াসলি ব্লেন্ডেড ইন হিম।" (ওই, পৃ ঃ ৯৩)। হাসতে হাসতে যাঁরা ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেছেন তাঁদের প্রায় সবাই বিবেকানন্দের চিন্তা ও অমিত তেজের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। 'ভুলিও না জন্ম হইতেই তুমি মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত'— বিবেকানন্দের এই আহ্বান তাঁদের ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে সর্বস্ব ত্যাগের শক্তি জুগিয়েছে।

পণ্ডিত দীনদয়াল যদি বিবেকানন্দ চিন্তার অনুগামী হতেন তা হলে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী চেতনার চর্চা তিনি করতেন এবং এক জাতি-এক প্রাণ-একতার চিন্তা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করত। কিন্তু কষ্টকঠিন সমস্যাসংকুল সেই পথে তিনি হাঁটেননি। পরাধীন যুগে ব্রিটিশের সাথে সংগ্রাম না করে তিনি ব্রিটিশকে বন্ধু হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন। এই কারণে মুসলিম লিগ যেমন মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করে ব্যাপক মুসলিম জনতাকে জাতীয়তবাদী সংগ্রামের প্রবাহের বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, পণ্ডিত দীনদয়াল ও তাঁর সংগঠন আরএসএস-ও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার তত্ত্ব প্রচার করে ব্যাপক হিন্দু জনতাকে জাতীয়তাবাদের মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেছিল। বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে হয়েছিল, অন্ধ-যুক্তিহীন হিন্দু সাম্প্রদায়িক মানসিকতা সৃষ্টি করতে হয়েছিল।

বিবেকানন্দ নিজেকে 'হিন্দু' বলতে গর্ব অনুভব করতেন এ কথা ঠিক। কিন্তু তাঁর এই চিন্তার মর্মবস্তুতে ছিল জাতীয়তাবাদ। সাম্প্রদায়িকতাকে তিনি ঘৃণা করতেন। রামকৃষ্ণের শিক্ষানুযায়ী তিনিও মনে করতেন— 'অসংখ্য নদী যেমন বিভিন্ন পর্বত থেকে বেরিয়ে এসে একই সমুদ্রে তাদের জলধারা মিশিয়ে দেয়, তেমনি বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ভূত হয়ে' মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে। এই জন্য তিনি সকল ধর্মকেই সত্য বলে মনে করতেন, ধর্মীয় অনুদারতাকে ঘৃণা করতেন। বলতেন, "আগে ধার্মিক হও, দিবার মতো কিছু অর্জন কর, তারপর জগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহা বিতরণ কর। ধর্ম বাক্যাড়ম্বর

> **এই কারণে মুসলিম লিগ যেমন মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করে ব্যাপক মুসলিম জনতাকে জাতীয়তবাদী সংগ্রামের প্রবাহের বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, পণ্ডিত দীনদয়াল ও তাঁর সংগঠন আরএসএস-ও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার তত্ত্ব প্রচার করে ব্যাপক হিন্দু জনতাকে জাতীয়তাবাদের মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেছিল।**

নহে, মতবাদ বিশেষ নহে, অথবা সাম্প্রদায়িকতা নহে।" এই জন্য স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে ইসলাম বিদ্বেষ তো দূরের কথা, ইসলাম ধর্মের মহত্ব ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। হজরত মহম্মদের প্রতি তিনি বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তাই তাঁর মুখে আমরা শুনি, "বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্মপরিণত ইসলাম ধর্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানব-সাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। আমরা মানব জাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই— যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই, অথচ বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমন্বয় দ্বারাই ইহা করিতে হইবে। ...আমাদের নিজের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই— বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ একমাত্র আশা।... আমি মানস চক্ষে দেখিতেছি, এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া মহামহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছে।" (বাণী ও রচনা, খণ্ড ৪, পৃ ঃ ২৬) "মহম্মদের ধর্ম আবির্ভূত হয় জনসাধারণের জন্য বার্তা রূপে। ...তাঁহার বাণী ছিল সাম্য। ...একমাত্র ধর্ম আছে— তাহা প্রেম। জাতি ধর্ম বা অন্য কিছুর প্রশ্ন নাই। এই সাম্যভাবে যোগ দাও। সেই কার্যে পরিণত সাম্যই জয়যুক্ত হইল। ...সেই মহতী বাণী ছিল খুব সহজ সরল... (ওই, পৃঃ ২২৮) । 'মুসলমানের ভারত-অধিকার দরিদ্র পদদলিতের উদ্ধারের কারণ হইয়াছিল। এই জন্যই আমাদের এক-পঞ্চমাংশ ভারতবাসী মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। কেবল তরবারির বলে ইহা সাধিত হয় নাই। নিছক তরবারি ও বন্দুকের বলে ইহা হইয়াছিল মনে করা নিতান্ত পাগলামি।" (ওই, পৃঃ ৩৯৫)।

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, "মুসলমান অভিযানকারীরা এশিয়াকে প্লাবিত করে ইউরোপকে অধিকার করতে উদ্যত হয়েছিল। স্পেনকে জয় করে তারা সেখানে বিরাট বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিল। সেখানে তখনকার পরিচিত পৃথিবীর সকল স্থান থেকে পণ্ডিতেরা আকৃষ্ট হয়ে এসেছিলেন। ভারতের প্রজ্ঞা, প্রাচ্যের জ্ঞানসম্পদের সঙ্গে এখানে পরিচয় সাধন করানো হত। দৈনন্দিন জীবনে শালীনতা, পরিমার্জনা ও সহবৎ তারা এনেছিল। পিছনে রেখে গিয়েছিল অতুলনীয় সৌন্দর্যময় সারসৈনিক স্থাপত্য, তৎসহ বিদ্যার ঐতিহ্য এবং প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের জ্ঞান ও সংস্কৃতির যথেষ্ট উপাদান।" (স্বামীজীকে যেমন দেখিয়াছি—নিবেদিতা, পৃঃ ২৪৯)

বিবেকানন্দ আরও বলেছেন, "অতীতে যত ধর্ম সম্প্রদায় ছিল, আমি সবগুলিই সত্য বলিয়া মানি এবং তাহাদের সকলের সহিতই উপাসনায় যোগদান করি।...আমি মুসলমানদিগের মসজিদে যাইব, খ্রিস্টানদের গির্জায় প্রবেশ করিয়া ক্রুশবিদ্ধ ঈশার সম্মুখে নতজানু হইব, বৌদ্ধদিগের বিহারে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধের ও তাহার ধর্মের শরণ লইব ..."। (স্বামীজীর বাণী ও রচনা, খণ্ড-৩, পৃঃ ১৪০) বিবেকানন্দের এই চিন্তার সাথে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের চিন্তার মিল কোথায়? তিনি তো দাঁড়িয়ে আছেন একেবারে বিপরীত মেরুতে! বিবেকানন্দ যখন উদারতা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার কথা প্রচার করছেন তখন দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রচার করছেন ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির— যার পরিণতি দাঙ্গা, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, লুঠতরাজ, হত্যা— মানবেতর সবকিছু। দীনদয়ালজিরা যে বিষবৃক্ষ রোপণ করে গেছেন তা এখন মহীরুহের আকার ধারণ করেছে।

২০০২ সালের গুজরাট গণহত্যার যে বীভৎসতা ভারত দেখেছে তা কি কোনও মানুষের কাজ হতে পারে? দীনদয়ালজির সংগঠন আরএসএস এবং তাঁর সৃষ্ট হিন্দু মহাসভার বর্তমান রূপ বিজেপি এই গণহত্যার হোতা। বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্মের নামে এই পৈশাচিক গণহত্যা কখনও সমর্থন করতে পারতেন?

ভারতের নবজাগরণের শিক্ষা ও চিন্তার বিরোধিতা করেছেন দীনদয়ালজিরা

ভারতের নবজাগরণের যাঁরা প্রাণপুরুষ তাঁরা যথার্থ বলেছিলেন, নতুন সমাজ গড়ে তোলার জন্য নতুন মানুষ দরকার। এই মানুষকে পুরনো সংস্কার ও ও কূপমণ্ডুকতা থেকে মুক্ত হতে হবে। নতুন ও উন্নত চিন্তার ভিত্তিতে নিজের মননকে গড়ে তুলতে হবে। এই জন্য দরকার 'ইউরোপীয় আকর থেকে জ্ঞানবিদ্যা সংগ্রহ করা'। এবং তা সম্ভব যদি ইংরেজি ভাষায় নিজেদের সুশিক্ষিত করা যায়। নিজে সংস্কৃত ও ফার্সি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। কিন্তু তিনি ইংরেজি ভাষা শিক্ষার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর বলেছেন, "সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি ইংরেজি সাহিত্যের সাথে পরিচিত করানো হয়, তা হলেই তারা বাংলা সাহিত্যের সর্বোত্তম ও যোগ্যতম স্রষ্টা বলে প্রমাণিত হবেন " (নোটস অন সংস্কৃত কলেজ, এপ্রিল-১২, ১৮৫২)। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গা-যমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই স্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে, কিন্তু তারা একসঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে " (রচনাবলি, ১১ খণ্ড, পৃ ঃ ৬৪৩)।

কিন্তু পণ্ডিত দীনদয়াল হেঁটেছেন একেবারে উল্টোপথে। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেননি, লড়াই করেছেন ইংরেজি ভাষার বিরুদ্ধে। বুক ফুলিয়ে বলেছেন, "ইংরেজি ভাষা তাড়াতে পারলে আমাদের জাতীয় মর্যাদা রক্ষিত হবে।" বলেছেন, "যদি ইংরেজি ভাষা থেকে যায়, তা হলে কোনও ভারতীয় ভাষাই বিকশিত হবে না।" ব্যাপারটা বুঝুন, ভাষা বিকাশের বিজ্ঞানের তিনি কোনও তোয়াক্কাই করলেন না, ইংরেজি বিদায়ের সাথে সাথে তো বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ প্রায় ছিন্ন হয়ে যাবে, আর তার ফলে তো ভারতীয় ভাষাগুলোর বিকাশ এবং সেই অর্থে হিন্দি ভাষা বিকাশের প্রক্রিয়াও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে! তা হলে? দীনদয়ালজির কথা হল, বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয় হোক, কিন্তু ইংরেজি ভাষাকে তাড়াতে হবে। চমকে উঠবেন না, দীনদয়ালজি সত্যিই এমন কথা বলেছেন তাঁর ভাষায়, "ইভেন অ্যাট দ্য রিস্ক অফ লুজিং অ্যাক্সেস টু মডার্ন সায়েন্টিফিক নলেজ, উই শুড ফ্রি আওয়ারসেলভস ফ্রম দ্য ক্লাচেস অফ দিজ ফরেন টাং।" অর্থাৎ, আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাথে সংযোগ হারানোর বিপদ থাকলেও এই বিদেশি ভাষার খপ্পর থেকে আমাদের নিজেদের মুক্ত করা উচিত। (উপরের উদ্ধৃতিগুলো সুধাকর রাজে সম্পাদিত 'পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, এ প্রোফাইল' গ্রন্থ থেকে গৃহীত)। কোথাও অস্পষ্টতা নেই। নাই বা রইল বিজ্ঞান, নাই বা রইল আধুনিক জ্ঞান— সনাতন ধর্ম থাকবে তো!' রাম নাম সত্য হ্যায়' বলতে বলতে কিশোরী বধূকে স্বামীর সাথে চিতায় তুলে পুড়িয়ে মারা যাবে তো! এ হলেই তো চলে যাবে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ঝামেলার দরকার কী?

দীনদয়ালজীরা এইভাবে অন্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন কিন্তু উগ্র ও যুক্তিহীন এক প্রজাতি সৃষ্টির নিদান দিয়ে গেছেন। ভারতবর্ষের পুঁজিবাদ এখন এই নিদান আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করছে। এই পুঁজিবাদ সংকটগ্রস্ত— সংকট তার ভিতরে, বাইরে, সর্বত্র। সংকট তার অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, সংকট তার জীবনবোধে। সভ্যতাকে সে আর কিছু দিতে পারে না, দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই। মানুষের চরিত্র হনন করেই তার টিকে থাকার চেষ্টা। তাই মহান মনীষীদের সে ভুলিয়ে দিতে চায়, আবার এমন মানুষদের সে সামনে আনতে চায় যারা সভ্যতা হননের কাজে তার সহযোগী হতে পারবে। দীনদয়ালজির 'মহামানব' ভাবমূর্তি গড়ে তোলার চেষ্টার মধ্য দিয়ে বিজেপি ভারতীয় পুঁজিবাদের সেই আকাঙ্ক্ষাকেই বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই চেষ্টা ভারতের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণ সফল হতে দিতে পারে না।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালিত

২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় বিজ্ঞান দিবস হিসাবে পালিত হয়। ১৯৮৬ সালের এই দিনটিতে নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী সি ভি রমন তাঁর বিখ্যাত 'রমন এফেক্ট' তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তারপর থেকে ভারতে এই দিনটি 'জাতীয় বিজ্ঞান দিবস' হিসাবে পালন করে আসছেন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। উদ্দেশ্য, জনমানসে বিজ্ঞান চেতনার সম্প্রসারণ।

এমনিতেই আমাদের দেশ ভারতে ঐতিহাসিক কারণে যুক্তিবাদের চর্চা বেশি দূর এগোয়নি। অজ্ঞ নিরক্ষরদের বাদ দিলেও সমাজে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরাও নানা ধরনের অর্থহীন সংস্কার, গোঁড়ামি এবং অন্ধবিশ্বাসের শিকার। একদল যাঁরা যুক্তিবাদকে মূল্য দেন, তাঁরাও বহু ক্ষেত্রে বিজ্ঞানমনস্কতাকে পুরোপুরি রক্ষা করতে পারেন না। এই সমাজ মানসিকতাই বিভেদের বিষবৃক্ষ বেড়ে ওঠার উর্বরভূমি। আজ দেশ জুড়ে শাসক শ্রেণির দ্বারা যুক্তিবাদের উপর যে আক্রমণ হচ্ছে, অন্ধ বিশ্বাস চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তার পরিণাম ভয়াবহ। এর হাত থেকে নিষ্কৃতি মিলছে না এমনকী বিজ্ঞানেরও।

দেশকে, দেশের জনগণকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার আহ্বানই ব্যক্ত হয়েছে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালনে। সেমিনার, বিতর্কসভা, স্লাইড শো, কুসংস্কার বিরোধী প্রদর্শন, শপথ বাক্য পাঠ, হাতে কলমে বিজ্ঞানের নানা পরীক্ষা-নিরিক্ষা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠন পালন করে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস।

শিক্ষার দাবিতে পার্লামেন্ট অভিযান

শিক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকারের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েমের প্রতিবাদে এবং ব্যাপক ফি-বৃদ্ধি ও সিলেবাসে সাম্প্রদায়িক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার বিরুদ্ধে এআইডিএসও সহ পাঁচটি বামপন্থী ছাত্রসংগঠনের যৌথ উদ্যোগে ১৮ ফেব্রুয়ারি হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী পার্লামেন্ট অভিযান করে। রামলীলা ময়দান থেকে মিছিল শুরু হয়ে পার্লামেন্ট স্ট্রিটে পৌঁছালে সেখানে এসএফআই, এআইএসএফ, এআইএসবি, পিএসইউ এবং এআইডিএসও-র নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। এআইডিএসও-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড অশোক মিশ্র, সহসভাপতি কমরেড মুকেশ সেমওয়াল এবং দিল্লি রাজ্য সম্পাদক কমরেড শ্রেয়া সিং কেন্দ্রীয় জনবিরোধী শিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা করেন। ১৯ ফেব্রুয়ারি পার্লামেন্ট অভিযান হয় জয়েন্ট ফোরাম ফর মুভমেন্ট অন এডুকেশন (জেএফএমই) এর ডাকে এই বিরাট মিছিলে ছাত্র সংগঠনগুলি ছাড়াও শিক্ষক সংগঠন-কর্মচারী সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেও অংশগ্রহণ ছিল। অন্যান্য নেতাদের পাশাপাশি এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষে বক্তব্য রাখেন দলের দিল্লি রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রাণ শর্মা, অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির দিল্লি শাখার পক্ষে অধ্যাপক নরেন্দ্র শর্মা।

রঘুনাথগঞ্জে গ্রামীণ ডাক্তারদের সম্মেলন

১৭ ফেব্রুয়ারি মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ বয়েজ হাই স্কুলে পিএমপিএআই রঘুনাথগঞ্জ ১ ও ২ ব্লক প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন চিকিৎসক মাহবুবুর রহমান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংগঠনের রাজ্য সহ সভাপতি ডাঃ রবিউল আলম। জঙ্গীপুর মহকুমার বিশিষ্ট সার্জেন ডাঃ ড্যানিয়েল মোস্তাফি, ডাঃ বিমানকুমার দাস, ডাঃ হেফজুর রহমান, ডাঃ সঞ্জীব চক্রবর্তী সহ তিন শতাধিক গ্রামীণ চিকিৎসক সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেন। সংগঠনের দাবি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কোর্স কারিকুলাম তৈরি করে ৬ মাস থেকে ১২ মাসের রেজিস্টার্ড ডাক্তারদের দিয়ে ট্রেনিং দিতে হবে, কোর্স শেষে সার্টিফিকেট দিতে হবে, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে, গ্রামীণ চিকিৎসক, যাঁরা ট্রেনিংপ্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁদের স্বাস্থ্য পরিকল্পনায় যুক্ত করতে হবে, দালাল চক্র বন্ধ করতে হবে, হাসপাতালের বেসরকারিকরণ ও ব্যবসায়ীকরণ বন্ধ করতে হবে, বিনামূল্যে জীবনদায়ী ঔষধ সরবরাহ করতে হবে। প্রধান বক্তা সংগঠনের উপদেষ্টা ডাঃ গৌরাঙ্গ প্রামাণিক গ্রামীণ চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণের বিষয় নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ব্লক হাসপাতালগতভাবে ডেপুটেশন, মিছিল করার ও ১৮ মার্চ কলকাতা নবান্ন অভিযানে দলে দলে যোগদান করার আহ্বান জানান।

মাতৃভাষা উর্দুতে প্রশ্নপত্রের দাবিতে ছাত্রমিছিল

মাতৃভাষায় প্রশ্নপত্রের দাবিতে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কলকাতায় মিছিল করল উর্দুভাষী ছাত্রছাত্রীরা। ৫২'এর ভাষা আন্দোলনের শহিদ বেদিতে মাল্যদান ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভার পর রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিলে নেতৃত্ব দেয় 'অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস স্ট্রাগল কমিটি'র ছাত্র নেতৃবৃন্দ। মিছিল শেষে দু'জন প্রতিনিধি মুখ্যমন্ত্রীকে গণস্বাক্ষরিত স্মারকলিপি দিতে নবান্ন যান।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক সৈয়দ হাসান, স্ট্রাগল কমিটির সম্পাদক সামসুল আলম, সহ-সম্পাদক গোলাম ওয়ারিশ, সভাপতি সুব্রত দাস সহ শতাধিক ছাত্রছাত্রী। সামসুল আলম বলেন, "উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংরেজি ভাষার সাথে উর্দু ভাষাতেও প্রশ্নপত্র দিতে হবে। উর্দুমাধ্যম বি এড কলেজ স্থাপন করতে হবে। স্কুলে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। উর্দুতে উন্নত মানের পাঠ্যবই প্রকাশ করতে হবে। কলেজের পরীক্ষায় উর্দু ভাষায় লেখার সুযোগ দিতে হবে। এই ন্যায্য এবং সঙ্গত দাবিগুলির ভিত্তিতে আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন চালাচ্ছি। কিছুদিন আগে শিক্ষামন্ত্রীকেও সমস্ত জানিয়ে স্মারকলিপি দিয়েছি। আজ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে দিলাম। সরকার দ্রুত উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে আন্দোলন আরও জোরদার করতে বাধ্য হব।"

ফি-বৃদ্ধির প্রতিবাদে কাশীপুর কলেজে
ডিএসও-র নেতৃত্বে ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভ

ছাত্র আন্দোলন ভাঙতে অধ্যক্ষ নামছেন পোস্টার ছিঁড়তে! এমন ঘটনাই ঘটল পুরুলিয়া জেলার কাশীপুর মহাবিদ্যালয়ে। ছাত্ররা অস্বাভাবিক ফি-বৃদ্ধির প্রতিবাদে পোস্টার লাগিয়েছিলেন।

জেলার কলেজগুলিতে সিবিসিএস সেমেস্টারের নামে চলছে নানা মোড়কে ফি আদায়। ক্লাসে পাখা ঘুরবে, এজন্য দিতে হবে ইলেক্ট্রিক ফি। গরমকালে কলেজে আসবে, অথচ ছাত্ররা 'হটওয়েদার চার্জ' দেবে না, তা কী করে হয়! উন্নয়নের জন্য ফি দিলেই হবে? ডেভলেপমেন্টের জন্য কি ফি দিতে হবে না? বছরে একবার ফি দিলেই কি হবে? প্রতি সেমেস্টারে দিতে হবে না? এ যেন নবাব-বাদশাদের আমলের মর্জিমাফিক কর আদায়ের ব্যবস্থা!

কলেজগুলির এই ছাত্রশোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে এ আই ডি এস ও। জেলার এ আই ডি এস ও নেতা কমরেড বিকাশরঞ্জন কুমার বলেন, ফি-কমানোর দাবিতে ১৮ ফেব্রুয়ারি অধ্যক্ষের কাছে ছাত্রছাত্রীরা গেলে আচমকা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বহিরাগত নেতারা তাদের আক্রমণ করে। ছাত্রছাত্রীরা তা প্রতিরোধ করে। কলেজের বাইরে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা ডি এস ও-র দুই কর্মীর উপর হামলা চালায়। ক্ষোভে ফেটে পড়ে ছাত্রছাত্রীরা কাশীপুর রাজবাড়ি মোড়ে পথ অপরোধ করে। ১৯ ফেব্রুয়ারি কলেজে পালিত হয় সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট, ছাত্ররা উদ্দীপ্ত প্রতিরোধের স্পৃহায় এ আই ডি এস ও-র আহ্বানে জেলা জুড়ে ধিক্কার দিবস পালন করে।

মদ নিষিদ্ধ করার দাবিতে
১৫ মার্চ
জেলায় জেলায় বিক্ষোভ

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com